ফিরে আসুক আনন্দময় ছোটোবেলা

লিপিকা ঘোষাল

অল্পবয়স কল্পবয়স

প্রথমেই মনে প্রশ্ন আসে শিশু আমরা কাদের বলব শুধু বয়স অল্প বললেই কিন্তু শিশুর একমাত্র সংজ্ঞার্থ তৈরি হয় না। বয়স তাদের-অল্প সেটার জন্য সময়ের ধারাপাত দায়ী । কিন্তু কোনো কোনো বিষয়ে তারা অনেক বড় । যেমন বড়োদের থেকে এরা অনেক রেশি দুরন্তপনা করতে পারো, এদের প্রাণশক্তিও অফূরন্ত, ক্লান্ত করতে পারে একমাত্র শরীর খারাপ । বাকি সব সময় এরা সমস্তক্ষণ চনমনে । যেটা বড়োরা ধরে রাখার জন্য যোগ ব্যায়াম থেকে চ্যবনপ্রাশ ইত্যাদি অনেক কিছু প্রকাশ্যে কিংবা সংগোপনে করে থাকো এরা বকতে পারে অনেক বেশি এদের বকবকানি কিন্তু বড়োদের মতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেটু হতাশাজনক কিংবা কোনো অভীষ্ঠী সিদ্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে চলে না। গোমরামুখো বড়দের পাশে এদের নানাপ্রকার অসংখ্য বিষয় নিসে বকে যাওয়া একটূও একঘেয়েমি ধরায় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশ চমক ধরয়ি-অনন্দ দেয়া আর ছোটোদের যে জিনিসটি আমাকে বেশ ভাবতে শেখায় সেটা তাদের কল্পনা শক্তিা নাণাপ্রকার রঙিন কল্পনা এ্যাকোরিয়ামের মাছের মতো এদের মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়া আমাদের । দুভাগ্য যে আমরা সেগুলি বাঁচিয়ে রাখতে পারি না কিংবা ধরতেও পারি না। একটী ছোট্ট তুলতুলে নরম মনের নিস্বার্থ ভালোবাসা মাখানো হাত দূটোর স্পর্শ অনেক মোহময় আকর্ষণের থেকে অনেক অনেক বড় মাপের আনন্দ দেয়া অর্থাৎ সব মিলিয়ে বলতে চাইছি যে ছোটোরা একমাত্র বয়সেই ছোটো কিন্তু অন্য অনেক দিক দিয়ে তারা আমাদের থেকে অনেক বড়ো, কিন্তু আমরা আমাদের বড়োত্বের চাপে তাদের সেই বড়ো হয়ে ওঠার সম্ভাবনাকে অবিকাংশ ক্ষেত্রেই নষ্ট করে ফেলি। এই দুর্ভাগ্যকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমাদের নেই

আজকের শিশু কালকের সম্ভাব্য যিশু

পৃথিবীতে জীবনটাকে যদি একটা রিলে রেসের মতো ধরা হয় তবে প্রতিটি মানূষকে রিলের লাঠিটা তার পরবর্তী প্রজন্মের শিশুর হাতেই ধরিয়ে দিতে হয়। এখন মনে প্রশ্নজাগে যে সেই শিশুটাকে আমরা কতখানি তৈরি করতে পারলামা। এখানেটু হাজারটা প্রশ্ন ভিড় করে আসে শিশুটিকে আমরা কী তৈরি করতে চাই আর কীভাবেই বা তৈরি করবা এই তৈরি হওয়টি অবশ্যই অভিভাবকদের উপর নির্ভর করে। অভিভাবকরা যে সবাই সমান শিক্ষিত এবং সমান অর্থবান এরকম নয় । বৈষ্যম্যের শুরু এখান থেকেই। তবে সকলেই কিন্ত তার শিশুটিকে তৈরি, হয়েছে দেখতে চায় । এখন প্রশ্ন এই তৈরি, কোন দিক থেকে ? শিশুটিকে কী অর্থবান, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত -মানুষ হিসাবে দেখতে চাওয়া ? এই চাওয়ার ক্ষেত্রে বোধহয় কোনো বৈষম্য নেই। সেইসঙ্গে থাকে আমি যা ছুতে পারিনি আমার শিশুটি যেন সেটা হয়ে দেখিয়ে দিতে পারো আর এখান থেকেই শুর শিশুর উপর চাপিয়ে দেওয়া ইচ্ছার বোঝা। হারিয়ে যেতে থাকে শিশুর জগত, তার ভাবনা কল্পনা, তার হলবোলার মতো বকে যাওয়ার দুনিয়াটা, হারিয়ে যায় তার এলোমেলো সবকিছু। এই চাপিয়ে দেওয়া থেকে বহু বছর আগে শিশু রবিও নিস্তার পানিন। কুস্তি থেকে অজি সবই শিখতে হয় তাকে। বড়ো হয়েও এই শিক্ষার য়ন্ত্রনা তাকে তারা করেছো। শিক্ষা- নামক প্রবন্ধলিতে বারংবার এ প্রসগে ণাভিশ্বাস তুলেছেন। শেষমেশ নিজের মনের মতো শিক্ষণ প্রণালী বানাতে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় (বিশ্বভারতী) বানিয়েই ফেললেনা। কিন্ত দুঃখ্যের বিষয় সব শিশু তো যিশু হতে পারে না, সব শিশু রবিও হতে পারে না। আর দেড়শ বছর পর বালক রবির জগৎটা যেভাবে পর্বতপ্রমাণ পাল্টে গেল, সেখানে শুধুমাত্র চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষাই নয়, সেখানে আছে চাপিয়ে দেওয়া দেখার জগৎ, খেলার জগৎ,

ভাবনার জগৎ। যে জগৎ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে নিজস্ব কল্পনার সাথে খেলা করবার কোনো সুযোগই যে নেই! টিভি, ভিডিও গেমস, কিম্পিউটার, মোবাইল, আইপড, ফেসবুক, কী নেই? আমার ভাবনার থেকে- তারা এগোয়ও দ্রুত । আমার কল্পনাকে তারা দ্রুত খেয়ে নিয়ে তাদের চিন্তাভাবণা চাপিয়ে দেয়। সুতরাং মগজের প্রতি কোষে যন্ত্ররা ঢুকে পড়ো এই যন্ত্রের যন্ত্রণা যখন টের পাওয়া যায় (ণাও পাওয়া যেতে পারে) তখন জীবনের শৈশব পর্বটি শেয হয়ে যায়া তখন আমাদেরই পোঁতা বিষবৃক্ষের বিষময় ফল খেয়ে শিও আর যিশু হয়ে ওঠে না — হয়ে ওঠে বিশু। আর এই বিশু-দের বিষের জালায় তখন সমাজের অন্যান্যদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। অড়িভাবকেরা প্রতিষ্ঠিত ছেলেদের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য যখন শেষের সে দিন কী ভয়ঙ্কর- আর বলে না, বলে শেষের সে দিন কী মধুময়, আর কেউ যদি হাসি মুখে তাদের জিজ্ঞাসা করে কেমন আছো, - তারা শুনে বসে কেমন আছো ?, তহি প্রকাশ্যে ভালো আছি বাবা বললেও মনে মনে বেল ফেলেন যেতে পারলে বাঁচি বাবা- - একথাটা তারা প্রত্যেকেই ভেতরে ভেতরে বলে ফেলেনা। সম্প্রতি ইচ্ছে সিনেমায় মায়ের অসহায় মুখের প্রতিচ্ছবি এখন বোধহয় প্রত্যেক ঘরের মায়ের মুখেই আছো। আর তা দেখার জন্য সিনেমায় যাওয়ার দরকার নেই। প্রত্যেক ঘরে ঘরেই পাওয়া যাবো।

যান্ত্রিকতা বনাম ভালোবাসা

আজকের শিশুর সঙ্কটের অবস্থানটা ঠিক কোথায় সেটাই বারংবার মাথায় ঘুরে ফিরে আসো। তারা কি হাতে পেল তা আমরা দেখার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা কি হারালো এর তালিকা বোধহয় পাওয়ার তালিকা থেকে বেশ দীর্ঘ । প্রথমেই তারা হারালো যৌথ পরিবারের সম্বিলিত ভালোবাসার জগৎ-কে। যেখানে আছে ঠাকুমা- দাদু- দিদিমা, পিসিমা- মাসিমা, কাকু- জেঠূ, বড়মা (জেঠিমা), ছোটমা (কাকিমা) আছে অনেক ভাই বোন যেখানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত একলা থাকার কিংবা একলা হওযার অবসরই নেই । ছিলো ঠানিদিদর গল্পবলার রুপকথাময় জগৎ. ছিল আচারের গন্ধ মাখা ছাদের দুপুরবেলা, ছিলো বড়োমা ছোটমার সেহ্নে আদর, মামাবাড়ির ছুটির দিনের কল্পজগৎ, ছিল বড়দা- বড়দিদিদের মিষ্টি শাসনা। এগুলো কোথায় যেন মিলিয়ে গেলা এমনকি মায়েদের সারাদিনের এক বিরটি সময় তারা চোখে দেখতে পায় না। কারণ বাবার সঙ্গো তারাও যে অর্থ উপার্জনে ব্যস্ত। তাহলে তারা কার কাছে থাকবে? বাড়িতে নেই ঠাকূমা-দিদা, দাদু। বাবা-মা চাকরির অবস্থানের কারণে কিংবা অন্য কোনো কারণে তাদের থেকে অনেক দু-রে, নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য কোনো বাড়ি, (পিসির বাড়ি .-- মামার বাড়ি ইত্যাদি) যাবার সময়ও হাতে নেহা। বাড়িতে আর কোনো ভাই বোন নেই। আসারও কোনো সম্ভবনা নেই। সব মিলিয়ে ঝাঁ- চকচকে মার্বেল বাড়িতে সেও এখন এক দামি আসবাব । ব্যতিক্রম কেবল তার একটা প্রাণ ও মন আছো । এই তার শিশু বেলাকে কবরে কফিনবন্দি করে বড়ো হতে থাকা। তার হাবাকার উপলব্ধি করার মানুষ পৃথিবীতে নেই। তাকে নিয়ে সমাজ, পরিবার যে নিষ্ঠুর খেলা খেলে সেখানে একটা জিনিসই বারবার ঘূরে ফিরে আসে। তা হল একটূ ভালোবাসা। একটূ তাদের মতো করে তাদের ভালোবাসা। সন্তান মানূয করার মূল উপাদান তথাকথিত স্বাভাবিকতা নয় বরং ভালোবাসা। সন্তান আমাদের কাছে দামী আসবাব ও নয়। আবার আমার বর্তমান সুখের কেনো প্রতিবন্ধক বস্তু নয়। আমরা তাকে এই পৃথিবীতে এনেছি। এ কথাটা আমরা ভুলে যাহা আর সে কারণেই তার ছোটোবেলাতো আমাদের কাছে আবর্জণার মতো। তাকে তাড়াতাড়ি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, করতে পারলেই আমরা ভাবি বেশ কিছু একটা করলামা কিন্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'শিব গড়তে বাঁদরই তৈরি হয়া। কারণ যে বয়সটা বাঁদরামির দরকার ছিল, তা সযত্নে বলপ্রয়োগ করে চাপা দেওয়াএকদিনা একদিন তা প্রকাশ তো পাবেই। আর শৈশবে যেটা শিশুর দুষ্টমি, বড় বেলায় সেটাই —বাঁদরামি, হিসাবে দেখা দেয়া তাই সেই বাঁদরামি আমাদের তো সহ্য

করতে হবেই। একসময় আমরাই আমাদের সৃষ্টি দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠি। কিন্ত এক্ষেত্রে জগন্নাথ হয়ে থাকা ছাড়া বোধছুয় আমাদের উপায় নেই।

দাও ফিরে আমার জগৎ লও এই পৃথিবী

আজকে মাতৃজঠর থেকে বেরিয়ে এসেই একটি শিশু দেখরে এই পৃথিবীকে। কিন্তু তখন সে শুধুই দেখবেই বুঝবে না, অনুভব করবে ণা। পৃথিবী আর তার মাঝখানে যোগগূত্রের কাজ করবে তার বাবা মা। সূতরাং বাবা মা শৈশব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই বাবা মাও আজকের দিনে অনেক সময়েই অসহায় । তারা তাদের সন্তানকে দিতে পারবে না তপোবনের স্নিগ্ধতা তারা দিতে পারবে না। গ্রাম্য পরিবেশের সরলতা তারা দিতে পারবে না, একেবারে অভিসন্ধিহীন বন্ধুতের সাহচার্য, এমনকি দিতে পারবে ণা তাদের কোনো অতিরিক্ত সময়, দিতে পারবে না কম্পিউটার, ইন্টারনেট, টিভি-র কলুষমুক্ত মুক্তাঞ্চলকে। এই সবগুলির ভালো দিক আছে জেনেও কিন্তু নিজের সন্তানের হাতে তারা এই জিনিসগুলি তুলে দিতে পাররে ণা। এক্ষেত্রে তাদের হাতে আছে একমাত্র তারা নিজেরাই। ভাল বাবা মা হওযার মানে সর্বক্ষণ পাশে থাকা, ধৈর্যধরতে শেখা, শুনতে শেখা এবং শোণার ভান করতে শেখা। সবটাই ভালোবাসার জন্যা নির্ভেজাল ভাবে ভালোবাসতে শিখতে হবে, যেখানে কোনো চাওয়া, পাওয়া, প্রত্যাশা, হতাশা নেই। এই অন্তরে অন্তর যোগ করাটাই এখনকার দিনে সবচেয়ে কঠিন এবং সবচেয়ে দূর্লভ। এ প্রসঙ্গে জেসি নেলসন নির্দেশিত ২০০১ সালের ছবি 'আই অ্যাম স্যাম-এর কথা খূব মনে পড়ে (সংবাদ প্রতিদিন-এর 'রোববার- আরও বেশি করে মনে করিয়েছে)। স্যাম প্রাপ্তবয়স্ক হলেও তার মানসিক গঠন সাত বছরের শিশুর মতো। জন্ম দিয়েই তার বাবা চলে যায়- মা কিছুদিন তাকে মানুষ করে হোম-এ আশ্রয় নেয়। সে একটা কাফে,-তে টেবিল মোছার কাজ করো তার শিশুর সারল্যের জন্য সবাই তাকে ভালোবাসে। এরই মাঝে রেবেকা বলে একটা চালচুলোহীন মেয়ে স্যাম-এর ঘরে আশ্রয় নেয় । রেবেকা গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং কন্যাসন্তানের জন্ম দিতেই স্যামের ঘাড়ে মেয়েকে গছিয়ে চমপট দেয়া। লুসিকে সে তার সারল্য দিয়ে মানুষ করে । যেখানে আছে একমাত্র তার সরল ভালোবাসা। লুসি বড়ো হয়। লূসি ধুঝতে পারে সে লেখাপড়া শিখলে চিন্তায বুদ্ধিতে তার বাবাকে ছাড়িয়ে যাবো এই কারণে ডিপার্টিমেন্ট অফ চাইল্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি সার্ভিস উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে নিজেদের তত্ত্বধানে নিয়ে চলে যায় । পরিণত মস্তিস্কের মারপ্যাচ অপরিণত মস্তিস্কের স্যাম ধুঝতে না পারলেও হাল ছাড়ল না। একজন সুহৃদ উকিলের তত্ত্বধানে চলে মামলা। বিরোধী পক্ষের উকিল যখন জিজ্ঞাসা করে স্যামকে আপনি কার মতো হতে চান ?সে উত্তর দেয়, আমার মতো । আর স্যামের মতো সর্বক্ষণ পাশে থাকা বাবাই হয়ে ওঠে লূসিদের মতো মেয়েদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় বাবা। মানসিক প্রতিবন্ধী হয়েও শুধুমাত্র ভালোবাসা দিয়ে -বাবা হওয়া যায়া এজন্য কোনো বড় মাপের চাকরিওয়ালা কিংবা ব্যাস্ত মানূষ হওয়ার দরকার নেই। বরং সেক্ষেত্রে শিসুর গুমরে থাকা অভিমান বোধহয় অনেক বেশি হয়ে ওঠে। এই কাহিনি আমাদের এই সত্যেরই মুখোমুখি করে তোলে।